লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
Siliguri ·Tuesday· September 26, 2017

মঙ্গলবার, ৯ আশ্বিন, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ২৭৯

পুজোয় শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে জেলা, পিছিয়ে নেই আবাসনের পুজোও

উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, রাজ্য জুড়ে একই ছবি।। প্রতিমা দর্শনে মাতাল শহর থেকে গ্রাম বাংলার মানুষ। সোমবার পঞ্চমীর সকাল থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে মানুষের ঢল নামে। পুজোর আমেজ শুরু হয়ে যায় চতুর্থীর রাত থেকেই। হাজার হাজার মানুষ নেমেছে পথে। রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ। এবারে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, শহরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে জেলা। কোনও খামতি নেই। প্রতিমার থিম থেকে সাবেকিয়ানা ছোঁয়া। হাওড়া, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, দুই মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া তো আছেই।

পাল্লায় সমানভাবে রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও মালদহের সর্বজনীন পুজো। একই সঙ্গে সাবেকিয়ানায় ভরপুর জেলায় জেলায় ইতিহাস খ্যাত সাবেক রাজবাড়ি, জমিদার বাড়ির পুজো। গ্রামের মানুষ সকাল থেকেই এসে জড়ো হয়েছেন বনেদী বাড়ির পুজোয়। একঝলক প্রতিমা দেখা, প্রসাদের অপেক্ষায় থাকা। এসবেরই প্রত্যাশায়। কলকাতা শহরে ট্রাফিক জ্যাম ছিল না। দুই এক জায়গায় যানজট হলেও মুহূর্তে তার সমাধান করেছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের হিসেব মতো ৮ থেকে ৯ হাজার পুলিশ কলকাতায় মোতায়েন ছিল ভিড় সামলাতে মানুষের নিরাপত্তায়।

প্রতিমা দর্শনে মানুষের ভিড় বেশী ছিল শহরের বড়বড় বারোয়ারিতে। তেমনি উৎসবে ভরপুর শহরতলি ও লাগোয়া আবাসনগুলিতে কোথাও থিম, কোথাও ছিল ঐতিহ্য। ফ্ল্যাট থেকে সপরিবারে এসেছেন আবাসনের মণ্ডপে। আবাসনের পুজোর বড় বৈশিষ্ট্য দু-বেলা পাত পেতে নানা পদে খাওয়া। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হাওড়া, শিয়ালদহ, কলকাতা রেলস্টেশনে বাইরে ছুটি কাটাতে যাওয়ার উপচে পড়া ভিড়। তেমনি পুজো উপলক্ষে দলে দলে প্রবাসী বাঙালি আসছেন ঘরে। সবমিলিয়ে জন উৎসব। এবারে কলকাতায় পুজো দেখতে এসেছেন বহু বিদেশি পর্যটক। তাদের নিরাপত্তায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়ায় ক্ষতি করার জন্য। তারা যেন কোনও সুযোগ নিতে না পারে। তা দেখতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ(মণির প্রতি)—তার মা নারা'ণকে বলেছে, তাঁকে দেখে আমরাই মুগ্ধ হই, তুই ত ছেলেমানুষ! **আর সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।** নিরঞ্জন কেমন সরল! মণি-আজ্ঞা, হাঁ।

নিরঞ্জন, নরেন্দ্র কি সরল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ--সেদিন কলকাতা যাবার সময় গাড়ীতে দেখলে না ? সব সময়েই এক ভাব —**সরল**। লোক ঘরের ভিতর এক রকম আবার বাড়ীর বাহিরে গেলে আর এক রকম হয়! নরেন্দ্র এখন(বাপের মৃত্যুর পর) সংসারের ভাবনায় পড়েছে। ওর একটু হিসাব বুদ্ধি আছে। সব ছোক্‌রা এদের মত কি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ নবীন নিয়োগীর বাড়ী—নীলকণ্ঠের যাত্রা

"নীলকণ্ঠের যাত্রা আজ শুন্‌তে গিছ্‌লাম--দক্ষিণেশ্বর। নবীন নিয়োগীর বাড়ী। সেখানকার ছেঁড়াগুনো বড় খারাপ। কেবল এর নিন্দা, ওর নিন্দা! ও রকম স্থলে ভাব সম্বরণ হয়ে যায়।" "সেবার যাত্রার সময় মধু ডাক্তারের চক্ষে ধারা দেখে, তার দিকে চেয়েছিলাম। আর কারু দিকে তাকাতে পার্‌লাম না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাহ্মসমাজ—সমন্বয় উপদেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ(মণির প্রতি)—আচ্ছা, লোক যে এত আকর্ষণ হ'য়ে আসে এখানে, তার মানে কি? মণি—আমার ব্রজের লীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ যখন রাখাল আর বৎস হলেন,তখন রাখালদের উপর গোপীদের , আর বৎসদের উপর গাভীদের, বেশী আকর্ষণ হতে লাগ্‌লো। শ্রীরামকৃষ্ণ--সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জান, মা এইরূপ ভেল্‌কি লাগিয়ে দেন, আর আকর্ষণ হয়।

দিনপঞ্জিকা

৯ আশ্বিন, ভাঃ ৪ আশ্বিন,**২৬ সেপ্টেম্বর**, ৯আহিন, সংবৎ ৬ আশ্বিন সুদি, ৫ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৮। **মঙ্গলবার, ষষ্ঠী** দিবা ঘ ৩।২২ মিঃ। অনুরোধানক্ষত্র দিবা ঘ ৭।১০মিঃ। প্রীতিযোগ দিবা ঘ ৯।৫৮মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ৩।২২ গতে গরকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।২৪ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ঘ ৭।১০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ, দিবা ঘ ৩।২২ গতে দ্বিপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৬।৫৯ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ২।২৯ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৬।৫৮ গতে ৮।২৯ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। দিবা ঘ ৩।২২ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**—-দীক্ষা। দিবা ঘ ৬।৫৯ মধ্যে। পুংসবন সীমান্তোন্নয়ন। **বিবিধ**—ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট। **শ্রীশ্রীদুর্গাষষ্ঠী**। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।২৯ মধ্যে, (কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘ ৬।৫৯ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘ ৮।২৯ গতে পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে) **শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ ও ষষ্ঠীবিহিত পূজা প্রশস্তা,** (অত্রকৃত্যে বারবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বহু সম্মতঃ)। **সায়ংকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস**। **জৈনধর্ম্মাবলম্বীদের ওলি পূর্ব্বারম্ভ। দক্ষিণেশ্বর** মঙ্গলঘাটে সাধুবাবা **শ্রীশ্রীদাস কৃষ্ণদাস ঠাকুরের** আবির্ভাবোৎসব। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ১১।০ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪১ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ৯।২০ গতে ১১।৪৮ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ৩।৬ মধ্যে ৪।৪৫ গতে ৫।৩০ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—রাত্রি ঘ ৭।৪১ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৯ আশ্বিন, ভাঃ ৪ আশ্বিন,২৬ সেপ্টেম্বর, ৯ আহিন,৫ মহরম। উঃ ঘ ৫।৩০, অঃ ঘ ৫।২৮ মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দিঃ ঘঃ ৩।২২। অদ্য ওফাত আব দাউদ মোহাদ্দেস রহঃ ৫ মহরম পর্দা হজঃ জাকারিয়া(আঃ)

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে

সেখ হাসান ইমাম

বাবা-মা যখন তাঁদের পুত্র সন্তানকে আশীর্বাদ করেন, তখন তাঁদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি—তাঁদের সন্তান সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত। আর এই প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি তার আর্থিক সমৃদ্ধি। তার গাড়ি বাড়ি থাকবে, ব্যাঙ্কে থাকবে অনেক টাকা,বহু মানুষ তার কথায় ওঠা-বসা করবে ইত্যাদি। তার অর্থ, উপার্জনের পথ কী হবে, ঐ অর্থ কোন পথে ব্যয়িত হবে, ব্যক্তিগত জীবনে সে কতটা মূল্যবোধ-নির্ভর জীবনযাপন করবে—সেসব কিন্তু মাথায় থাকে না। সেভাবে তাকে শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবাও হয় না। আকাঙ্খা একটাই— সমাজে সে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হোক, অনেক বাবা-মায়ের ইচ্ছেপূরণও হয়—আর্থিক কৌলিন্যে ছেলের মাথা অনেকটাই উঁচু হয়ে ওঠে, কিন্তু মানবিক মূল্যবোধের বিচারে, দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই সে মাথায় খাটো হয়ে আছে। তার কারণ, যা সাময়িক স্বস্তি দেয়, তার পিছনে ছুটেই আমরা সন্তান-সন্ততিকে উদ্বুদ্ধ করি। শাশ্বত মূল্যবোধের শিক্ষায় তাদের উজ্জীবিত করি না। তাই শেষ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় পেয়ে নিজের মনে হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের 'স্পর্শমণি' কবিতায় পরশমাণিক সন্ধানকারী মানুষটি যখন তার বহু আকাঙ্খিত পরশমাণিক হাতে পেল, তখন হরষের বদলে দেখা দিল বিষাদ। সে সেটি নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দিল। তার বোধোদয় হয়েছে। সে নশ্বর কোন কিছু চায় না, যা অমৃত, যা অবিনশ্বর, সে তার একটু ভাগ চায়। 'যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি /তাহারি খানিক মাগি আমি নত শিরে /এত বলি নদী নীরে ফেলিল মাণিক।' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী দুই পত্নী-কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, তিনি তাঁর বিপুল ধন সম্পদ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। তাদের কোন অভাবই থাকবে না। কাত্যায়নী সন্তুষ্ট চিত্তে এ বিধান মেনে নিলেও বিদূষী মৈত্রেয়ী মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যকে কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "যেনাহংনা মৃতাস্যাৎ কিমহং তেন কুর্যাম ?"—যা আমাকে অমৃত দিতে পারে না, তা নিয়ে আমি কী করব? অমৃতের সন্তানেরা কিন্তু আজ পথহারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যূত। তারা মানকি ফেলে কাচ সংগ্রহে ব্যস্ত; যা কিছু নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর, তা অর্জনেই তাদের প্রাণান্তকর প্রয়াস। তাদের সমুদ্রমন্থনে অমৃতকুম্ভের দেখা মেলেনি, উঠে এসেছে রাশি রাশি গরল। তা ধারণ করার জন্য বিশেষ কোন নীলকণ্ঠকে পাওয়া যায়নি। তাই তো বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে। দেশ-কাল-পাত্র, জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সকলের তনুই আজ সেই জীবনঘাতী বিষে জর্জর। তাই দেখি, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য-নিঠুর দ্বন্দ্ব। ঘোর কুটিল পন্থতার লোভজটিল বন্ধ।' —রবীন্দ্রনাথ। জীবনানন্দ আক্ষেপ করেন, 'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর। যুদ্ধশেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল/মনুষ্যের লালসার শেষ নেই।' 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় বুদ্ধদেব বসুর উচ্চারণ। 'সভ্যতার শ্মশান-শয্যায় /সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়। প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা/রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে। সুন্দরের বিদ্ধ করে বর্বর রাক্ষস হাঁকে 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়'/দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে তীরে কাঁপে থরো থরো/ উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।' 'মানুষ' শব্দটি কবিতায় শিহাব সরকার আর্তনাদ করেন, 'মানুষ শব্দটি উচ্চারণে/ দেখি শুধু, ধুম্রজাল, কুয়াশাও বলা যায় /এমন দুঃসহ শূন্যতা, স্পষ্ট অবয়বহীন, চরিত্রহীন.... চারিদিকে ইঁদুর, বেড়াল, গাধা, গরু/প্রাণীরা আছে বলে মানুষ নাম সার্থক হয়েছে/ মানুষের তৃষ্ণার শেষ নেই/ দেখেছি আধ খাওয়া হরিণ ফেলে পরিতৃপ্ত বাঘ/বনের গভীরে চলে যায়/ মানুষ নাচে উচ্ছিষ্টের ওপর।' বলা যায়, লক্ষ্যহারা উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ পৌঁছে গেছে খাদের কিনারে। পতন ও মৃত্যু কেবল সময়ের অপেক্ষা।

পশ্চিমের সাধনা-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুধু ভোগের উপকরণ বাড়িয়েই চলেছে। কিন্তু মানুষ জানে, ক্রমাগত ভোগে ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণ কমতে থাকে। সেই স্পৃহা তখন অন্য বস্তুতে কেন্দ্রীভূত হয়। তার ফলে, 'শক্তিদম্ভ স্বার্থ লোভ মারীর মতন/ দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।/দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার/শান্তিময় পল্লি যত করে ছারখার।' ভোগবাদী সভ্যতা তাদের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়ে যন্ত্রে পরিণত করেছে। প্রাচীনতম সভ্যতার ধারক ও বাহক প্রাচ্যও আজ আত্মবিস্মৃত। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তারও ছোটার শেষ নেই। অধিকাংশ সাধারণ মানুষ শান্তিকামী লোকালয়ে খুন-জখম, নারী-নির্যাতনের ঘটনা ঘটত ক্বচিৎ কদাচিৎ। আজ কিন্তু তা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আমাদের চারদিকে আমাদের অতি পরিচিত তরুণ-তরুণীদের দ্বারাই ঘটছে, অনেক রোমহর্ষ কান্ডকারখানা-পিটিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা , কুপিয়ে মারা, গুলি করে মারা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণ ও খুন, মিথ্যে আশ্বাসে সহবাস, অ্যাসিড ছোঁড়া ইত্যাদি এখন প্রতিদিনের খবর। তাৎক্ষণিক উত্তেজনাই এর একমাত্র কারণ নয়, কখনও বেশ ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনামাফিক এসব অন্যায় কাজ করা হচ্ছে। নকশাল আমলে ব্যক্তি হত্যায় মেতেছিল একদল যুবক। এখনও সন্ত্রাসবাদীরা মানুষ খুন করছে নির্বিচারে যত্রতত্র। কিন্তু এসব সাধারণ মানুষের কাছে ততটা মাথাব্যথার কারণ নয়, যতটা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে আপাত নিরীহ শান্ত নাগরিকদের হঠাৎ হঠাৎ হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠা এবং সেই হিংসার ক্রমপ্রসরমান পরিধির মধ্যে অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীদেরও ঢুকে পড়া। স্কুলে পড়া ছেলে, সামান্য কারণে তার সহপাঠীকে প্রাণঘাতী আঘাত হানছে, মা ঠান্ডা মাথায় তার কোলের শিশুকে গলা টিপে অথবা বিষ খাইয়ে খুন করছে; উত্তেজনায় অথবা প্ররোচনায় স্বামী-স্ত্রীকে, স্ত্রী-স্বামীকে হত্যা করছে।

(ক্রমশ)

আদিকাল থেকে খুঁজে দেখা বাঙালি-জন্মভূমি-মাতৃভাষা

মুরারি মোহন চক্রবর্তী

পর্ব ৩

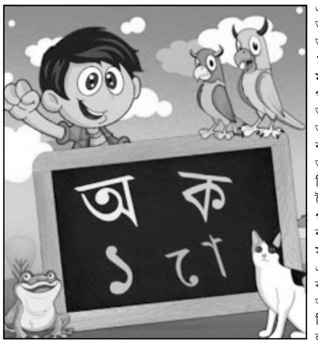

কঠোরপন্থীদের তরবারি নির্ভর দীর্ঘ ইতিহাস, যা আজও দেখতে পাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও উগ্রধারা নেই বললে অসত্য বলা হবে। তাদের কেউই সুন্দর সমাজের জন্য, মানবতার জন্য কাম্য নয়। মুক্তমনা সকলেই প্রথমে মানুষ, পরে বাঙালি, সব শেষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, মুসলমান ইত্যাদি যখন বলপূর্বক বা প্রলুব্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হয়, তখন জীবনচর্চায়, অভ্যাসে, নানাপ্রকার বদল ঘটে যায়। হিন্দুধর্মের বিত্তবান ও উচ্চবর্ণের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি যুক্ত শ্রেণির নিপীড়নে ধারাবহিক অত্যাচারে অসহনীয় যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে ধর্মান্তরিত হয়েছেন অনেকে, আক্রমণকারীরাও ধর্মান্তরিত করেছে বলপূর্বক। রাষ্ট্রশক্তির ইন্ধনে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ মানসিকতায় ঢুকিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এইভাবে বাঙালি জাতিকে দুর্বল করতে চেষ্টা হয়েছে বারবার। এইপ্রকার নানাবিধ কারণে ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। পুঁজিবাদী শক্তি আজ ধর্মভিত্তিক বাঙালি জাতির অনৈক্যের সুযোগে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে যাচ্ছে। ভৌগোলিক দূরত্ব,ধর্মীয় দূরত্বের বিপরীতে বেশি সংখ্যক সাধারণ বাঙালি তার বাঙালিত্বে আজও ঐক্যবদ্ধ। বাঙালি মানসিকতার সংস্কৃতির গঠনমূলক ধারা আজও মুখ্য ধারা।

বাঙালির ভূমি ঃ বাঙালির বাসস্থানের কথা বলার পূর্বে যে কথাটা উল্লেখ করা দরকার তা হল, বাংলা-বাঙালি এই নাম কীভাবে হ'লো ? নৃতাত্বিকদের মতে, আদিতে বাংলার একাধিক অঞ্চলে প্রধানত অস্ট্রিক জাতি ভুক্ত সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি এবং দ্রাবিড় জাতির বংশধরদের বাসস্থান ছিল। অস্ট্রিক দেবতা 'বোঙ্গা', এই নাম থেকেই বঙ্গ শব্দ এসেছে। এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই, সবাই একপ্রকার মান্যতা দিয়েছেন। এবার আসা যাক, ভূমির নাম প্রসঙ্গে অনেকেই জানি, প্রাচীন কালে এক নামে এই ভূখন্ড পরিচিত ছিল না। পশ্চিমাঞ্চলের নাম ছিল রাঢ়ভূমি, লাড়ভূমি, তাম্প্রলিপ্ত , পুন্ড্র। বৌধায়ন ধর্ম সূত্রে গ্রন্থে বঙ্গ, পুন্ড্র, সূম্র এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নাম—সমতট, হারিকেল, বঙ্গালদেশ উত্তরাঞ্চল—গৌড় বা গৌড়াঙ্গ এবং বারেন্দ্রভূমি নামটিও জানা যায়। আরও পূর্বের নামের তালিকায় —পাতালভূমি হরাপ্পাদের দেশ, বক দ্বীপ, কিলফিলা ভূমি, রসাতল প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। এ দেশের নামের কাহিনী বলেছেন সম্রাট আকবরের সভার এক রত্ন আবুল ফজল ।তিনি বলেছেন, বঙ্গশব্দের সাথে 'আল' শব্দটি যুক্ত হয়ে বঙ্গাল--বাঙ্গাল --বাংলাদেশ হয়েছে (অখন্ড) বাংলায় বারেন্দ্রভূমি অঞ্চলে সর্বপ্রথম চাষের জামিতে আল দেওয়ার প্রচলন হয়। সপ্তম শতাব্দীর আদি ভাগে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হন। তার সময়ে খন্ডগুলি একত্র করে অখন্ড এক রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন শশাঙ্ক। পালরাজারা ও সেন রাজারা একই উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ সফল হতে পারেননি। পাঠান শাসনকালে একত্রে যুক্ত করে তুলতে চাওয়ায় সাফল্য আসে। ইংরাজ আমলে বাংলা নামটি অখন্ডরূপে আরও প্রতিষ্ঠা পায়। প্রাচীন কালে সমগ্র বাংলার সীমানা ছিল, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো পাহাড়, পশ্চিমে রাজমহল। মধ্যযুগ পর্যন্ত সীমানা চিহ্নিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক ও ভাষাগত কারণে অনেক অদল বদল ঘটেছে। বর্তমান অবস্থা আমরা জানি, নতুন করে উল্লেখ করার কিছু নেই। যে নামেই হোক আর যে ভূখন্ডেই হোক মানসিকতায়, বাঙালিত্বের ধারায় সবাই বঙ্গসন্তান, বাঙালি নামে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেন না, এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।

বাঙালির মাতৃভাষা—সবার প্রিয় বাংলা ভাষা ঃ বাংলাভাষা কীভাবে পেলাম এবং এ ভাষা কত প্রাচীন? অনেকের মনের মধ্যে এই ধরণের জিজ্ঞাসা হয়তো ভিড় করে, ভিড় না করলে জানার চাহিদা সৃষ্টিও হয় না। সেই অর্থে আমরা জানতে চাওয়ার উত্তরের সন্ধান করে চলি। এখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কী বলছে, সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব। খানিকটা অতীত সময়ের কিছু কথা প্রথমে বুঝে নিতে হ'লে জানতে হবে, ভাষা বিশেষজ্ঞ তাত্ত্বিকেরা কী বলছেন, পৃথিবীর ভাষাগুলিকে তাঁরা ১২টি ভাষা পরিবারে ভাগ করেছেন। পরিবারগুলির ১, ৭, ৮, ৯ নং ভাষাপরিবারের ভাষা ভারতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১ নং ইন্দো-ইউরোপীয় (ভারত-ইউরোপীয় বা ভারতীয়) ১ ভাষাপরিবার ৮টি শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখাটির নাম ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য। এর মধ্যে ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ১) ইরানীয়, ২) দরদীয় বা পিশাচ, ৩) ভারতীয় আর্য। ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক প্রবণতাকে বিচার করে এর ইতিহাসকে প্রথমত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (১৫০০/১২০০--৬০০ খ্রিঃপূ) ২) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (৬০০ খ্রিঃ পূঃ – ১০০০খ্রিঃ) ৩) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (১০০০খ্রিঃ-আধুনিককাল) বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, আর্যদের বৈদিকভাষা যখন অপ্রচলিত হয়ে পড়তে লাগল (৬০০ খ্রিঃপূঃ সময় কালে) তখন, বৈয়াকরণ পাণিনি (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬/৭ শতকে অভির্ভূত) সংস্কার করে অর্থাৎ ঘসা মাজা করে সাহিত্যকর্মের বাহন করে তুললেন, এই ভাষাকে আমরা সংস্কৃত ভাষা বলে জানি। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছিলেন, সংস্কৃত ভাষা, গ্রিক ও লাটিনের মতো মাতৃভাষা নয়। ভারতের নানাস্থানে, সংস্কৃত ভাষায় কিছু মানুষ এখনও নিজেদের মধ্যে কথা বলেন। বই পত্র লেখা হয়, সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়। পাণিনির নিয়মকানুন এতটাই বিজ্ঞানভিত্তিক যা আজও অটুট আছে। আর্যভাষার অপভ্রংশ থেকে ১০ শতাব্দী পর্যন্ত ভাষাগত পরিবর্তন চলতে থাকে। তিনটি পরিবর্তনের কথা জানা যায়—পালি, প্রকৃত, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। স্থানভেদে প্রাকৃত ভাষার ৪টি স্তর। ক) শৌরসেনী খ) মহারাষ্ট্রি গ) মাগধী ও অর্ধ বা জৈন মাগধী। মাগধী- অপভ্রংশ অবহটঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম (ভাষাতাত্বিকদের মতে) শুরু হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার নিজস্ব ধারা। সময়কাল নিয়ে একাধিক মত থাকলেও ৯৫৩ খ্রিঃ চর্যাপদ বা গীতির রচনা কাল হিসাবে ধরা হয়। (ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে) এই মতের মান্যতা অনেকের মান্যতায় স্বীকৃত হয়েছে। বাংলা ভাষা চর্চার ক্রমোন্নত দীর্ঘ পথটি আজ পর্যন্ত বিচার বিশ্লেষণ করে অবস্থান ও অবস্থার সময়ের ব্যবধানে তিনটি কল্পরূপে ভাগ করা হয়েছে। যথা—আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগ। আদি যুগের বাংলা ভাষা- সাহিত্যের বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না আমাদের। আমাদের চোখের বাইরে বহু দূরে প্রতিবেশি রাষ্ট্র নেপালের রাজ পাঠাগারে চাপা পড়ে ছিল বাঙালি জাতির মহামূল্যবান বাংলাভাষার প্রথম রচনা। (ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

বিবেকানন্দ আদর্শের একটি নাম

আমাদের কাছে বিবেকানন্দ এক আদর্শের নাম। যিনি মানুষের কথা ভাবতেন। যিনি মানুষের ভালবাসার কথা ভাবতেন। যদি এইরকম মানুষের স্পর্শে থাকা না যায়, তাহলে এই আদর্শ, এই ভালবাসা একেবারেই বৃথা হয়ে যায়। একটা থালা আছে, তার পাশে গ্লাস আর বাটী রয়েছে, গ্লাসভর্তি জলও রয়েছে, একটা আসনও পাতা আছে। একেবারে ভালবাসা দিয়েই পাতা হয়েছে, তবে থালাতে ভাত পড়েনি। আসলে ভাতটা হয়নি। তাই ভাতটা থালায় এসে পৌঁছেতে পারেনি। এখানে একটা খালি থালার যে দৃশ্যটা উঠে আসে, সেই থালাটাকে কেমন বেমানান দেখায় না! কোথায় যেন ভালবাসাটাই হারিয়ে গেছে। আজও বহু থালায় এইভাবে ভাতের সাথে যে সম্পর্ক থাকে না। তখন বে-মানান হিসাবে থালাটা পড়ে থাকে। এখানেই আন্তরিকতার প্রয়োজনটা থেকে যায়। তবেই সেটা ভালবাসায় পরিণত হয়। একটা মায়ের মূর্তি বসানো হয়েছে। তার হাত দুটো কলেতে রয়েছে। এই দৃশ্যটা দেখার পর মনে হয়, কোথায় যেন একটা শূন্যস্থান রয়েছে। শিল্পী চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু যে সঠিকভাবে মূতিটাকে দেখতে পারে, সে বলে দিতে পারে শিল্পীর ভুলটা কোথায়। তখন রাতের অন্ধকারে এসে একটা ছোট্ট শিশুকে তৈরি করে মায়ের কোলে বসিয়ে দেয়। মূর্তিটা তখনই পরিপূর্ণতায় ভরে ওঠে। যে অভাবটা ছিল, সেটা বসে যেতেই মূর্তিটার রূপটা একেবারে বদল হয়ে গেল। মায়ের কোলেতে শিশু-সন্তানটাই তো থাকবে। সেটাই তো মূর্তিটার আসল আকর্ষণ। এখানে স্বামীজীও ভাবতেন একটা মন্দির গড়ে, ইষ্ট দেবতার নাম করার সাথে সাথে মানুষের ভালবাসাটাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে, মানুষকে পরিসেবা দিয়ে একটা নতুন জগতের সাথে একেবারে নতুনভাবে পরিচয় করে দেবো। এই ভাবনাটাকে বাস্তবে রূপ দিতেই, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। আর একটি আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ১৯শে মার্চ যে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আশ্রমের নাম 'মায়াবতী' আলমোড়ায় অদ্বৈত আশ্রম হিসাবে আজও রয়েছে। এখানে তিনি নিজের আদর্শটাকেই সবার কাছে তুলে ধরতে পেরেছিলেন বলেই, আজও তিনি বিবেকানন্দ নামেই জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছেন। আদর্শ আর ভালবাসাই যে শেষ কথাটা বলে যায়।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া-৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়